শিশু ভোলানাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিশু ভোলানাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

প্রকাশ ১৯২২
পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৩৮
সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৩৫২, মাঘ ১৩৫৫, চৈত্র ১৩৫৬
পৌষ ১৩৫৮, মাঘ ১৩৬০, আশ্বিন ১৩৬২, শ্রাবণ ১৩৬৪
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, মাঘ ১৩৬৮, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, বৈশাখ ১৩৭২
ফাল্গুন ১৩৭৪ : ১৮৮৯ শক

প্রকাশক বিশ্বভারতী
গ্রন্থনবিভাগ : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস : ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা ৪
১২·১

শিরোনাম-সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি দুই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব ;
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে।
প্রলয়ের ঘূর্ণচক্র-'পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে ;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।

অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরই তো কোনো মূল্য নাই,
রচিস যা-তোর-ইচ্ছা তাই
যাহা-খুশি তাই দিয়ে,
তার পর ভুলে যাস যাহা-ইচ্ছা তাই নিয়ে।
আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে দিগম্বর—
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধূলি-'পর।

লজ্জাহীন, সজ্জাহীন, বিত্তহীন, আপনা-বিস্মৃত—
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি—
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।

শিশুর জীবন

ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস
আছে কি এক ফোঁটা,
তাই তো এমন বুড়ো হয়েই মরি।
তিলে তিলে জমাই কেবল,
জমাই এটা ওটা,
পলে পলে বাক্স বোঝাই করি।
কালকে-দিনের ভাব্না এসে
আজ-দিনেরে মারলে ঠেসে,
কাল তুলি ফের পরদিনের বোঝা।
সাধের জিনিস ঘরে এনেই
দেখি এনে ফল কিছু নেই—
খোঁজের পরে আবার চলে খোঁজা।

ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত
দেখতে না পাই পথ,
তাকিয়ে থাকি পর্শুদিনের পানে।

ভবিষ্যৎ তো চিরকালই
থাকবে ভবিষ্যৎ,
ছুটি তবে মিলবে বা কোন্‌খানে ?
বুদ্ধিদীপের আলো জ্বালি,
হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি—
হিসেব করে পা টিপে পথ হাঁটি।
মন্ত্রণা দেয় কতজনা—
সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা,
পদে পদে হাজার খুঁটিনাটি।

শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখোশখানা
খসাব এক টানে,
দেখব তারেই বর্তমানের কালে।
ছাদের কোণে পুকুর-পাড়ে
জানব নিত্য-অজানারে,
মিশিয়ে রবে অচেনা আর চেনা ;
জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরি হবে আমার খেলা,
সুখ রবে মোর বিনামূল্যেই কেনা।

বড়ো হবার দায় নিয়ে এই
বড়োর হাটে এসে
নিত্য চলে ঠেলাঠেলির পালা।
যাবার বেলায় বিশ্ব আমার
বিকিয়ে দিয়ে শেষে
শুধুই নেব ফাঁকা কথার ডালা!
কোন্‌টা সস্তা কোন্‌টা দামি
ওজন করতে গিয়ে আমি
বেলা আমার বইয়ে দেব দ্রুত—
সন্ধ্যা যখন আঁধার হবে
হঠাৎ মনে লাগবে তবে
কোনোটাই না হল মনঃপূত।

বাল্য দিয়ে যে জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হোক-না তাহা সারা।
জলে স্থলে সঙ্গ আবার
পাক্‌-না বাঁধন-হীন,
ধুলায় ফিরে আসুক-না পথহারা।
সম্ভাবনার ডাঙা হতে
অসম্ভবের উতল স্রোতে
দিই-না পাড়ি স্বপন-তরী নিয়ে।

আবার মনে বুঝি-না এই
বস্তু ব'লে কিছুই তো নেই—
বিশ্ব গড়া যা-খুশি-তাই দিয়ে।

প্রথম যে দিন এসেছিলেম
নবীন পৃথ্বীতলে
রবির আলোয় জীবন মেলে দিয়ে,
সে যেন কোন্ জগৎ-জোড়া
ছেলেখেলার ছলে,
কোথাথেকে কেই বা জানে কী এ!
শিশির যেমন, রাতে রাতে
কে যে তারে লুকিয়ে গাঁথে—
ঝিল্লি বাজায় গোপন ঝিনিঝিনি!
ভোরবেলা যেই চেয়ে দেখি,
আলোর সঙ্গে আলোর এ কী
ইশারাতে চলছে চেনাচিনি!

সে দিন মনে জেনেছিলেম,
নীল আকাশের পথে
ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগালো বুঝি!

যা-কিছু সব চলেছে ঐ
ছেলেখেলার রথে
যে যার আপন দোসর খুঁজি খুঁজি।
গাছে খেলা ফুল-ভরানো,
ফুলে খেলা ফল-ধরানো,
ফলের খেলা অঙ্কুরে অঙ্কুরে।
স্থলের খেলা জলের কোলে,
জলের খেলা হাওয়ার দোলে,
হাওয়ার খেলা আপন বাঁশির সুরে।

ছেলের সঙ্গে আছ তুমি
নিত্য ছেলেমানুষ
নিয়ে তোমার মাল-মশলার ঝুলি।
আকাশেতে ওড়াও তোমার
কত রকম ফানুস,
মেঘে বোলাও রঙ-বেরঙের তুলি।
সে দিন আমি আপন-মনে
ফিরেছিলেম তোমার সনে,
খেলেছিলেম হাত মিলিয়ে হাতে।
ভাসিয়েছিলেম রাশি রাশি
কথায়-গাঁথা কান্না হাসি
তোমারই সব ভাসান খেলার সাথে।

ঋতুর তরী বোঝাই কর
রঙিন ফুলে ফুলে,
কালের স্রোতে যায় তারা সব ভেসে।
আবার তারা ঘাটে লাগে
হাওয়ায় দুলে দুলে
এই ধরণীর কূলে কূলে এসে।
মিলিয়েছিলেম বিশ্বডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়,
সাজিয়েছিলেম ঋতুর তরণীতে—
আশা আমার আছে মনে,
বকুল কেয়া শিউলি -সনে
ফিরে ফিরে আসবে ধরণীতে।

সে দিন যখন গান গেয়েছি
আপন-মনে নিজে,
বিনা কাজে দিন গিয়েছে চলে,
তখন আমি চোখে তোমার
হাসি দেখেছি যে—
চিনেছিলে আমায় সাথি ব'লে।
তোমার ধুলো তোমার আলো
আমার মনে লাগত ভালো,
শুনেছিলেম উদাস-করা বাঁশি।

বুঝেছিলে সে ফাল্গুনে
আমার সে গান শুনে শুনে
তোমারও গান আমি ভালোবাসি।

দিন গেল, ঐ মাঠে বাটে
আঁধার নেমে প'ল ;
এ পার থেকে বিদায় মেলে যদি
তবে তোমার সন্ধেবেলার
খেয়াতে পাল তোলো,
পার হব এই হাটের ঘাটের নদী।
আবার ওগো শিশুর সাথি,
শিশুর ভুবন দাও তো পাতি,
করব খেলা তোমায় আমায় একা।
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়— তোমার জগৎটিকে—
সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।

৪ কার্তিক ১৩২৮

তালগাছ

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়—
একেবারে উড়ে যায়—
কোথা পাবে পাখা সে ?

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার
মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।

সারা দিন ঝর্‌ঝর্ থত্থর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি—
যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

২ কার্তিক ১৩২৮

বুড়ি

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বুড়ি
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাত শো হাজার কুড়ি।
সাদা সুতোয় জাল বোনে সে,
হয় না বুনোন সারা—
পণ ছিল তার ধরবে জালে
লক্ষ কোটি তারা।

হেনকালে কখন আঁখি
পড়ল ঘুমে ঢুলে,
স্বপনে তার বয়সখানা
বেবাক গেল ভুলে।
ঘুমের পথে পথ হারিয়ে
মায়ের কোলে এসে
পূর্ণ চাঁদের হাসিখানি
ছড়িয়ে দিল হেসে।

সন্ধেবেলায় আকাশ চেয়ে
কী পড়ে তার মনে!
চাঁদকে করে ডাকাডাকি,
চাঁদ হাসে আর শোনে।
যে পথ দিয়ে এসেছিল
স্বপন-সাগর-তীরে
দু হাত তুলে সে পথ দিয়ে
চায় সে যেতে ফিরে।

হেনকালে মায়ের মুখে
যেমনি আঁখি তোলে
চাঁদে ফেরার পথখানি যে
তক্‌খনি সে ভোলে।
কেউ জানে না কোথায় বাসা,
এল কী পথ বেয়ে—
কেউ জানে না এই মেয়ে সেই
আদ্যিকালের মেয়ে।

বয়সখানার খ্যাতি তবু
রইল জগৎ জুড়ি—
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
ডাকে 'বুড়ি বুড়ি'।

বুড়ি

সব চেয়ে যে পুরানো সে
কোন্ মন্ত্রের বলে
সব চেয়ে আজ নতুন হয়ে
নামল ধরাতলে!

১৫ ভাদ্র ১৩২৮

রবিবার

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়া-গাড়ি ?
রবিবার সে কেন, মা গো,
এমন দেরি করে ?
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশ-পারে তার বাড়িটি
দূর কি সবার চেয়ে ?
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে ?

সোম মঙ্গল বুধের খেয়াল
থাকবারই জন্যেই,
বাড়ি-ফেরার দিকে ওদের
একটুও মন নেই।

রবিবার

রবিবারকে কে যে এমন
বিষম তাড়া করে,
ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন
আধ ঘণ্টার পরে।
আকাশ-পারে বাড়িতে তার
কাজ আছে সব চেয়ে—
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে?

সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি,
ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেমনি উঠি জেগে
রবিবারের মুখে দেখি
হাসিই আছে লেগে।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মুখে চেয়ে—
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে?

৫ আশ্বিন ১৩২৮

সময়হারা

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম ; কেউ যদি কয় মন্দ
আমি বলব, 'দশটা বাজাই বন্ধ।'
তাধিন তাধিন তাধিন।

শুই নে বলে রাগিস যদি আমি বলব তোরে,
'রাত না হলে রাত হবে কী করে—
নটা বাজাই থামল যখন কেমন করে শুই ?
দেরি ব'লে নেই তো, মা, কিচ্ছুই।'
তাধিন তাধিন তাধিন।

যত জানিস রূপ্‌কথা, মা, সব যদি যাস ব'লে
রাত হবে না, রাত যাবে না চলে ;
সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না তো খেলা,
ফুরোয় না তো গল্প বলার বেলা।
তাধিন তাধিন তাধিন।

মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুন্‌গুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত আমার
দোল্‌না ঠেলে ঠেলে—
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলিবনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে!

কবে বুঝি আনত মা সেই
ফুলের সাজি বয়ে—
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হয়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে,
জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে,
মনে হয় মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধ'রে কবে
দেখত আমায় চেয়ে—
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।

৯ আশ্বিন ১৩২৮

পুতুল ভাঙা

‘সাত আট্‌টে সাতাশ’ আমি
বলেছিলাম ব’লে
গুরুমশায় আমার ’পরে
উঠল রাগে জ্বলে।
মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায়
এবার রথের দিনে
সেই-যে রঙিন পুতুলখানি
আপনি দিলে কিনে
খাতার নীচে ছিল ঢাকা ;
দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগেমেগে
ভেঙে দিলেন ফেলে।
বললেন, ‘তোর দিন রাত্তির
কেবল যত খেলা।
একটুও তোর মন বসে না
পড়াশুনোর বেলা !’

পুতুল ভাঙা

মা গো, আমি জানাই কাকে ?
ওঁর কি গুরু আছে ?
আমি যদি নালিশ করি
এক্‌খনি তাঁর কাছে ?
কোনোরকম খেলার পুতুল
নেই কি, মা, ওঁর ঘরে ?
সত্যি কি ওঁর একটুও মন
নেই পুতুলের 'পরে ?
সকাল-সাঁজে তাদের নিয়ে
করতে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেন নি কি
কোনোরকম হেলা ?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে,
বল্‌ দেখি, মা, ওঁর মনে তা
কেমনতরো লাগে।

৯ আশ্বিন ১৩২৮

মুর্খু

নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোঁসাই।
আমি তো, মা, চাই নে হতে
পণ্ডিত মশাই।
নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,
মুর্খু হয়ে রইব তবে ?
আমার তাতে কীই বা হবে—
মুর্খু যারা তাদেরই তো
সমস্তখন ছুটি।

তারাই তো সব রাখাল ছেলে
গোরু চরায় মাঠে।
নদীর ধারে বনে বনে
তাদের বেলা কাটে।

মূর্খ

ডিঙির 'পরে পাল তুলে দেয়,
ঢেউয়ের মুখে নাও খুলে দেয়,
ঝাউ কাটতে যায় চলে সব
নদীপারের চরে।
তারাই মাঠে মাচা পেতে
পাখি তাড়ায় ফসল-খেতে,
বাঁকে করে দই নিয়ে যায়
পাড়ার ঘরে ঘরে।

কাস্তে হাতে, চুব্‌ড়ি মাথায়,
সন্ধে হলে পরে
ফেরে গাঁয়ে কৃষাণ-ছেলে—
মন যে কেমন করে।
যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশাই দুপুর বেলায়
ব'সে ব'সে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন্ গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান—
শুনে আমি পণ করি যে
মূর্খ হব ব'লে।

মূর্খ

দুপুর বেলায় চিল ডেকে যায়,
হঠাৎ হাওয়া আসি
বাঁশ-বাগানে বাজায় যেন
সাপ-খেলাবার বাঁশি।
পুবের দিকে বনের কোলে
বাদল-বেলার আঁচল দোলে,
ডালে ডালে উছলে ওঠে
শিরীষফুলের ঢেউ।
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে
পাঠশালা সব ছাড়তে বলে—
আমি জানি এরা তো, মা,
পণ্ডিত নয় কেউ।

যাঁরা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান,
ঘরে ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান।
সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা,
ধুমধামে যায় সারা বেলা—
আমি তো, মা, চাই নে আদর
তোমার আদর ছাড়া।

মুর্খ

তুমি যদি মুর্খ ব'লে
আমাকে, মা, না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদ্‌লা-মেঘের পাড়া।

সেখান থেকে বৃষ্টি হয়ে
ভিজিয়ে দেব চুল,
ঘাটে যখন যাবে, আমি
করব হুলুস্থুল।
রাত থাকতে অনেক ভোরে
আসব নেমে আঁধার ক'রে,
ঝড়ের হাওয়ায় ঢুকব ঘরে
দুয়ার ঠেলে ফেলে ;
তুমি বলবে মেলে আঁখি
'দুষ্টু দেয়া খেপল নাকি',
আমি বলব 'খেপেছে আজ
তোমার মুর্খ ছেলে'।

১০ আশ্বিন ১৩২৮

সাত-সমুদ্র-পারে

দেখছ না কি নীল মেঘে আজ
　　আকাশ অন্ধকার ?
সাত-সমুদ্র তেরো নদী
　　আজকে হব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
　　নাইকো হরিশ খোঁড়া—
তাই ভাবি যে কাকে আমি
　　করব আমার ঘোড়া।

কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই
　　বাবার খাতা থেকে,
নৌকো দে-না বানিয়ে— অমনি
　　দিস, মা, ছবি এঁকে।
রাগ করবেন বাবা বুঝি
　　দিল্লি থেকে ফিরে ?
ততক্ষণ যে চলে যাব
　　সাত-সমুদ্র-তীরে।

এমনি কি তোর কাজ আছে মা—
কাজ তো রোজই থাকে।
বাবার চিঠি এক্‌খুনি কি
দিতেই হবে ডাকে?
নাই বা চিঠি ডাকে দিলে,
আমার কথা রাখো—
আজকে নাহয় বাবার চিঠি
মাসি লিখুন-নাকো।

আমার এ যে দরকারি কাজ,
বুঝতে পার না কি!
দেরি হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি।
মেঘ কেটে যেই রোদ উঠবে
বৃষ্টি বন্ধ হলে,
সাত-সমুদ্র তেরো-নদী
কোথায় যাবে চলে!

১০ আশ্বিন ১৩২৮

জ্যোতিষী

ঐ-যে রাতের তারা
জানিস কি, মা, কারা ?
সারাটি খন ঘুম না জানে,
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমনধারা।
আমার যেমন নেইকো ডানা,
আকাশ-পানে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেমনি ওদের পা নেই ব'লে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর 'পরে।

সকালে যে নদীর বাঁকে
জল নিতে যাস কল্‌সি কাঁখে
সজনেতলার ঘাটে,
সেথায় ওদের আকাশ থেকে
আপন ছায়া দেখে দেখে
সারা পহর কাটে।

ভাবে ওরা চেয়ে চেয়ে
'হতেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকাল-সাঁজে
কল্‌সিখানি ধরে বুকে
সাঁৎরে নিতেম মনের সুখে
ভরা নদীর মাঝে'।

আর, আমাদের ছাতের কোণে
তাকায়, যেথা গভীর বনে
রাক্ষসদের ঘরে
রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে—
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে
জাগাই শয্যা-'পরে!
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে
হ'ত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলায় খেলায়,
তার পরে সেই রাতের বেলায়
ঘুমোত তোর সাথে।

জ্যোতিষী

যেদিন আমি নিষুত রাতে
হঠাৎ উঠি বিছানাতে
  স্বপন থেকে জেগে,
জান্‌লা দিয়ে দেখি চেয়ে,
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
  ঝাপ্‌সা আছে মেঘে।
ব'সে ব'সে ক্ষণে ক্ষণে
সেদিন আমার হয় যে মনে
  ওদের স্বপ্ন ব'লে।
অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই
ওরা আসে সেই পহরেই,
  ভোর বেলা যায় চলে—
আঁধার রাতি অন্ধ ও যে—
দেখতে না পায়, আলো খোঁজে—
  সবই হারিয়ে ফেলে—
তাই আকাশে মাতুর পেতে
সমস্ত খন স্বপনেতে
  দেখা-দেখা খেলে।

১০ আশ্বিন ১৩২৮

খেলা-ভোলা

তুই কি ভাবিস, দিন-রাত্তির
খেলতে আমার মন ?
কক্‌খনো তা সত্যি না মা,
আমার কথা শোন্।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে,
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে ;
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পুজোর সানাই বাজছে দূরে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে—
খেলনাগুলো সামনে মেলি
'কী যে খেলি' 'কী যে খেলি'
সেই কথাটাই সমস্ত খন
ভাবনু আপন-মনে !
লাগল না ঠিক কোনো খেলাই,
কেটে গেল সারা বেলাই—
রেলিঙ ধরে রইনু বসে
বারান্দাটার কোণে।

খেলা-ভোলার দিন মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমনতরো বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাতের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগ্‌নি রঙের শাড়ি ;
চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই,
তেপান্তরের পার বুঝি ঐ—
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাকত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া,
তক্‌খুনি যে যেতেম তারে
লাগাম দিয়ে ক'ষে।
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় ব'সে।

এক-এক দিন যে দেখেছি তুই
বাবার চিঠি হাতে
চুপ করে কি ভাবিস ব'সে
ঠেস দিয়ে জানলাতে।
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে
তুই যেন কোন্ দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের
অনেক দূরের মা ;
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই--
হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠ-পারে কোন্ বটের তলার
বাঁশির সুরের মা।
খেলার কথা যায় যে ভেসে—
মনে ভাবি, কোন্ কালে সে
কোন্ দেশে তোর বাড়ি ছিল
কোন্ সাগরের কূলে।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
অজানা সেই দ্বীপের ঘরে
তোমায় আমায় ভোর বেলাতে
নৌকোতে পাল তুলে।

১১ আশ্বিন ১৩২৮

পথহারা

আজকে আমি কত দূর যে
গিয়েছিলেম চলে !
যত তুমি ভাবতে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা
তোমায় ব'লে ব'লে ।

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর ।
মাঝখানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ, কত যে খেত—
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুর-বাড়ি,
ছাড়িয়ে তালিমপুর ।

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে
সাত-কুশি সব গ্রাম ।
ধানের গোলা গুনব কত
জোদ্দারদের গোলার মতো,
সেখানে যে মোড়ল কারা
জানি নে তার নাম ।

একে একে মাঠ পেরোলুম
কত মাঠের পরে।
তার পরে, উঃ, বলি মা, শোন্,
সামনে এল প্রকাণ্ড বন—
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
গা ছম্ ছম্ করে।

জামতলাতে বুড়ি ছিল—
বললে, 'খবরদার!'
আমি বললেম বারণ শুনে,
'ছ-পণ কড়ি এই নে গুনে।'
যতক্ষণ সে গুনতে থাকে
হয়ে গেলেম পার।

কিছুরই শেষ নেই কোথাও
আকাশ পাতাল জুড়ি।
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো-মুখোশ-পরা আঁধার
সাজল জুজুবুড়ি।

খেজুর গাছের মাথায় বসে
দেখছে কারা ঝুঁকি।
কারা যে সব ঝোপের পাশে
একটুখানি মুচকে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মারে উঁকি।

আমায় যেন চোখ টিপছে
বুড়ো গাছের গুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কাদের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে—
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সুড়্‌সুড়ি!

ফিস্‌ফিসিয়ে কইছে কথা
দেখতে না পাই কে সে।
অন্ধকারে হুদ্দাড়িয়ে
কে যে কারে যায় তাড়িয়ে,
কী জানি কী গা চেটে যায়.
হঠাৎ কাছে এসে!

ফুরোয় না পথ, ভাবছি আমি
ফিরব কেমন করে!
সামনে দেখি কিসের ছায়া—
ডেকে বলি, 'শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দে-না মোরে।'

কয় না কিছুই, চুপটি ক'রে
কেবল মাথা নাড়ে।
সিঙ্গিমামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন এসে ডেকে
কে জানে, মা, হালুম ক'রে
পড়ল যে কার ঘাড়ে।

বল্ দেখি তুই কেমন ক'রে
ফিরে পেলেম মাকে।
কেউ জানে না কেমন ক'রে।
কানে কানে বলব তোরে?—
যেম্‌নি স্বপন ভেঙে গেল
সিঙ্গিমামার ডাকে।

১৫ আশ্বিন ১৩২৮

সংশয়ী

কোথায় যেতে ইচ্ছে করে
　　শুধাস কি মা তাই ?
যেখান থেকে এসেছিলেম
　　সেথায় যেতে চাই।
কিন্তু সে যে কোন্ জায়গা
　　ভাবি অনেক বার।
মনে আমার পড়ে না তো
　　একটুখানি তার।

ভাব্না আমার দেখে বাবা
　　বললে সেদিন হেসে,
'সে জায়গাটি মেঘের পারে
　　সন্ধ্যাতারার দেশে।'
তুমি বল, 'সে দেশখানি
　　মাটির নীচে আছে,
যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে
　　ফুল ফোটে সব গাছে।'

মাসি বলে, 'সে দেশ আমার
আছে সাগরতলে,
যেখানেতে আঁধার ঘরে
লুকিয়ে মানিক জ্বলে।'
দাদা আমার চুল টেনে দেয়,
বলে, 'বোকা ওরে,
হাওয়ায় সে দেশ মিলিয়ে আছে,
দেখবি কেমন ক'রে ?'
আমি শুনে ভাবি, আছে
সকল জায়গাতেই।
সিধু মাস্টার বলে শুধু,
'কোনোখানেই নেই।'

রাজা ও রানী

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পির্‌ভু কেমন নাচে!
ডালে ছিলেম চ'ড়ে,
সেটা ভেঙেই গেল প'ড়ে।
সে দিন হল মানা
আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,
রথ দেখতে যাওয়া,
আমার চিঁড়ের পুলি খাওয়া।
কে দিল সেই সাজা—
জান কে ছিল সেই রাজা?

রাজা ও রানী

এক যে ছিল রানী
আমি তার কথা সব মানি।
সাজার খবর পেয়ে
আমায় দেখল কেবল চেয়ে।
বললে না তো কিছু,
কেবল মুখটি করে নিচু
আপন ঘরে গিয়ে
সেদিন রইল আগল দিয়ে।
হল না তার খাওয়া
কিম্বা রথ দেখতে যাওয়া।
নিল আমায় কোলে
সাজার সময় সারা হলে।
গলা ভাঙা-ভাঙা,
তার চোখ-দুখানি রাঙা।
কে ছিল সেই রানী
আমি জানি জানি জানি।

দূর

পুজোর ছুটি আসে যখন
বক্‌সারেতে যাবার পথে
দূরের দেশে যাচ্ছি ভেবে
ঘুম হয় না কোনোমতে।
সেখানে যেই নতুন বাসায়
হপ্তা দুয়েক খেলায় কাটে,
দূর কি আবার পালিয়ে আসে
আমাদেরই বাড়ির ঘাটে!
দূরের সঙ্গে কাছের কেবল
কেনই যে এই লুকোচুরি,
দূর কেন যে করে এমন
দিন রাত্তির ঘোরাঘুরি।

আমরা যেমন ছুটি হলে
ঘর-বাড়ি সব ফেলে রেখে
রেলে চড়ে পশ্চিমে যাই,
বেরিয়ে পড়ি দেশের থেকে,
তেম্‌নিতরো সকালবেলা
ছুটিয়ে আলো আকাশেতে

রাতের থেকে দিন যে বেরোয়
দূরকে বুঝি খুঁজে পেতে।
সেও তো যায় পশ্চিমেতেই—
ঘুরে ঘুরে সন্ধে হলে
তখন দেখে রাতের মাঝেই
দূর সে আবার গেছে চলে।

সবাই যেন পলাতকা,
মন টেঁকে না কাছের বাসায়—
দলে দলে পলে পলে
কেবল চলে দূরের আশায়।
পাতায় পাতায় পায়ের ধ্বনি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ডাকাডাকি,
হাওয়ায় হাওয়ায় যাওয়ার বাঁশি
কেবল বাজে থাকি থাকি।
আমায় এরা যেতে বলে—
যদি বা যাই, জানি তবে
দূরকে খুঁজে খুঁজে শেষে
মায়ের কাছেই ফিরতে হবে।

বাউল

দূরে অশথতলায়
পুঁতির   কণ্ঠীখানি গলায়
বাউল,   দাঁড়িয়ে কেন আছ ?
সামনে আঙিনাতে
তোমার   একতারাটি হাতে
তুমি   সুর লাগিয়ে নাচো।
পথে করতে খেলা
আমার   কখন হল বেলা,
আমায়   শাস্তি দিল তাই।
ইচ্ছে হোথায় নাবি,
কিন্তু   ঘরে বন্ধ চাবি,
আমার   বেরুতে পথ নাই।
বাড়ি ফেরার তরে
তোমায়   কেউ না তাড়া করে,
তোমার   নাই কোনো পাঠশালা।
সমস্ত দিন কাটে
তোমার   পথে ঘাটে মাঠে,
তোমার   ঘরেতে নেই তালা !

তাই তো তোমার নাচে
আমার প্রাণ যেন, ভাই, বাঁচে—
আমার মন যেন পায় ছুটি।
ওগো, তোমার নাচে
যেন ঢেউয়ের দোলা আছে,
ঝড়ে গাছের লুটোপুটি।
অনেক দূরের দেশ
আমার চোখে লাগায় রেশ
যখন তোমায় দেখি পথে।
দেখতে যে পায় মন
যেন নাম-না-জানা বন
কোন্ পথহারা পর্বতে।
হঠাৎ মনে লাগে
যেন অনেক দিনের আগে
আমি অম্‌নি ছিলেম ছাড়া।
সেদিন গেল ছেড়ে,
আমার পথ নিল কে কেড়ে,
আমার হারাল একতারা।
কে নিল গো টেনে
আমায় পাঠশালাতে এনে,
আমার এল গুরুমশায়।

মন সদা যার চলে
যত ঘরছাড়াদের দলে
তারে ঘরে কেন বসায় ?
কও তো আমায় ভাই—
তোমার গুরুমশায় নাই ?
আমি যখন দেখি ভেবে
বুঝতে পারি খাঁটি,
তোমার বুকের একতারাটি
তোমায় ঐ তো পড়া দেবে।
তোমার কানে কানে
ওরই গুন্‌গুনানি গানে
তোমায় কোন্ কথা যে কয়!
সব কি তুমি বোঝ ?
তারই মানে যেন খোঁজ
কেবল ফিরে ভুবনময়।
ওরই কাছে বুঝি
আছে তোমার নাচের পুঁজি,
তোমার খ্যাপা পায়ের ছুটি ?
ওরই সুরের বোলে
তোমার গলার মালা দোলে,
তোমার দোলে মাথার ঝুঁটি।

মন যে আমার পালায়
তোমার একতারা-পাঠশালায়—
আমায় ভুলিয়ে দিতে পারো ?
নেবে আমায় সাথে ?
এ-সব পণ্ডিতেরই হাতে
আমায় কেন সবাই মারো ?
ভুলিয়ে দিয়ে পড়া
আমায় শেখাও সুরে-গড়া
তোমার তালা-ভাঙার পাঠ।
আর কিছু না চাই—
যেন আকাশখানা পাই
আর পালিয়ে যাবার মাঠ।
দূরে কেন আছ ?
দ্বারের আগল ধ'রে নাচো
বাউল, আমারই এইখানে।
সমস্ত দিন ধ'রে
যেন মাতন ওঠে ভ'রে
তোমার ভাঙন লাগা গানে।

দুষ্টু

তোমার কাছে আমিই দুষ্টু,
ভালো যে আর সবাই !
মিত্তিরদের কালু নীলু
ভারি ঠাণ্ডা ক' ভাই !
যতীশ ভালো, সতীশ ভালো,
ন্যাড়া নবীন ভালো—
তুমি বল, ওরাই কেমন
ঘর করে রয় আলো।
মাখনবাবুর দুটি ছেলে
দুষ্টু তো নয় কেউ—
গেটে তাদের কুকুর বাঁধা
করতেছে ঘেউ-ঘেউ—
পাঁচকড়ি ঘোষ লক্ষ্মী ছেলে
দত্তপাড়ার গবাই—
তোমার কাছে আমিই দুষ্টু,
ভালো যে আর সবাই !

দুষ্টু

তোমার কথা আমি যেন
শুনি নে কক্‌খনোই,
জামা কাপড় যেন আমার
সাফ থাকে না কোনোই,
খেলা করতে বেলা করি,
বৃষ্টিতে যাই ভিজে—
দুষ্টুপনা আরো আছে
অম্‌নি কত কী যে!
বাবা আমার চেয়ে ভালো?
সত্যি বলো তুমি,
তোমার কাছে করেন নি কি
একটুও দুষ্টুমি?
যা বলো সব শোনেন তিনি,
কিচ্ছু ভোলেন নাকো?
খেলা ছেড়ে আসেন চ'লে
যেম্‌নি তুমি ডাকো?

ইচ্ছামতী

যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে এক্‌খনি হই
ইচ্ছামতী নদী।
রইবে আমার দখিন ধারে
সূর্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধেবেলায়
নামবে অন্ধকার।
আমি কইব মনের কথা
দুই পারেরই সাথে—
আধেক কথা দিনের বেলায়,
আধেক কথা রাতে।

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই
আপন গাঁয়ের ঘাটে
ঠিক তখনি গান গেয়ে যাই
দূরের মাঠে মাঠে।

গাঁয়ের মানুষ চিনি, যারা
নাইতে আসে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা
সাঁৎরে ও পার চলে।
দূরের মানুষ যারা তাদের
নতুনতরো বেশ,
নাম জানি নে, গ্রাম জানি নে—
অদ্ভুতের এক-শেষ!

জলের উপর ঝলোমলো
টুকরো আলোর রাশি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন,
হাততালি আর হাসি।
নীচের তলায় তলিয়ে যেথায়
গেছে ঘাটের ধাপ
সেইখানেতে কারা সবাই
রয়েছে চুপচাপ।
কোণে-কোণে আপন-মনে
করছে তারা কী কে!
আমারই ভয় করবে কেমন
তাকাতে সেই দিকে।

গাঁয়ের লোকে চিনবে আমার
কেবল একটুখানি
বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে
আমিই সে কি জানি!
এক ধারেতে মাঠে ঘাটে
সবুজ বরন শুধু,
আর-এক ধারে বালুর চরে
রৌদ্র করে ধূ ধূ।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা,
রাত্তিরে থম্ থম্!
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে
করবে গা ছম্ ছম্।

২৩ আশ্বিন ১৩২৮

অন্য মা

আমার মা না হয়ে তুমি
আর-কারো মা হলে
ভাবছ তোমায় চিনতেম না,
যেতেম না ঐ কোলে ?
মজা আরো হ'ত ভারি,
দুই জায়গায় থাকত বাড়ি—
আমি থাকতেম এই গাঁয়েতে,
তুমি পারের গাঁয়ে।
এইখানেতেই দিনের বেলা
যা-কিছু সব হ'ত খেলা,
দিন ফুরোলেই তোমার কাছে
পেরিয়ে যেতেম নায়ে।
হঠাৎ এসে পিছন দিকে
আমি বলতেম, 'বল্ দেখি কে !'
তুমি ভাবতে, 'চেনার মতো,
চিনি নে তো তবু।'
তখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমি বলতেম গলা ধরে,
'আমায় তোমার চিনতে হবেই,
আমি তোমার অবু।'

অন্য মা

ঐ পারেতে যখন তুমি
আনতে যেতে জল,
এই পারেতে তখন ঘাটে
বল্ দেখি কে বল্।
কাগজ-গড়া নৌকোটিকে
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
যদি গিয়ে পৌঁছত সে
বুঝতে কি, সে কার ?
সাঁতার আমি শিখি নি যে,
নইলে আমি যেতেম নিজে—
আমার পারের থেকে আমি
যেতেম তোমার পার।
মায়ের পারে অবুর পারে
থাকত তফাত, কেউ তো কারে
ধরতে গিয়ে পেত নাকো—
রইত না এক-সাথে।
দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে
দেখাদেখি দূরে দূরে—
সন্ধেবেলায় মিলে যেত
অবুতে আর মা'তে।

কিন্তু হঠাৎ কোনো দিনে
যদি বিপিন মাঝি
পার করতে তোমার পারে
নাই হ'ত, মা, রাজি ?
ঘরে তোমার প্রদীপ জ্বেলে
ছাতের 'পরে মাহুর মেলে
বসতে তুমি, পায়ের কাছে
বসত ক্ষান্তবুড়ি—
উঠত তারা সাত ভায়েতে,
ডাকত শেয়াল ধানের খেতে,
উড়ো ছায়ার মতো বাহুড়
কোথায় যেত উড়ি।
তখন কি মা, দেরি দেখে
ভয় হ'ত না থেকে থেকে—
পার হয়ে, মা, আসতে হ'তই
অবু যেথায় আছে।
তখন কি আর ছাড়া পেতে ?
দিতেম কি আর ফিরে যেতে ?
ধরা পড়ত মায়ের ও পার
অবুর পারের কাছে।

দুয়োরানী

ইচ্ছে করে, মা, যদি তুই
হতিস দুয়োরানী—
ছেড়ে দিতে এম্‌নি কি ভয়
তোমার এ ঘরখানি ?
ঐখানে ঐ পুকুরপাড়ে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
ও যেন ঘোর বনের মধ্যে—
কেউ কোত্থাও নেই।
ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাকব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে,
আসবে না কেউ তোমার কাছে,
দিন রাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে।
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে,
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে।

আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অম্‌নি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।
শিঙগুলি সব আঁকাবাঁকা,
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে।
ওরা সবাই আমায় বোঝে,
করবে না ভয় একটুও যে—
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে,
বসবে কাছে ঘেঁষে।

ফলসা-বনে গাছে গাছে
ফল ধ'রে মেঘ করে আছে—
ঐখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।
শালিকরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,
কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে।

দিন ফুরোবে, সাঁঝের আঁধার
নামবে তালের গাছে।
তখন এসে ঘরের কোণে
বসব কোলের কাছে।
থাকবে না তোর কাজ কিছু তো,
রইবে না তোর কোনো ছুতো,
রূপ্‌কথা তোর বলতে হবে
রোজই নতুন ক'রে।
সীতার বনবাসের ছড়া
সবগুলি তোর আছে পড়া ;
সুর ক'রে তাই আগাগোড়া
গাইতে হবে তোরে।
তার পরে যেই অশথবনে
ডাকবে পেঁচা, আমার মনে
একটুখানি ভয় করবে
রাত্রি নিষুত হলে।
তোমার বুকে মুখটি গুঁজে
ঘুমেতে চোখ আসবে বুজে—
তখন আবার বাবার কাছে
যাস নে যেন চলে।

১৪ আশ্বিন ১৩২৮

রাজমিস্ত্রি

বয়স আমার হবে তিরিশ,
দেখতে আমায় ছোটো—
আমি নই, মা, তোমার শিরীষ,
আমি হচ্ছি নোটো।
আমি যে রোজ সকাল হলে
যাই শহরের দিকে চলে
তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চ'ড়ে।
সকাল থেকে সারা দুপর
ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর
খেয়াল-মত দেয়াল তুলি গ'ড়ে।
ভাবছ তুমি, নিয়ে ঢেলা
ঘর-গড়া সে আমার খেলা—
কক্‌খনো না, সত্যিকার সে কোঠা।
ছোটো বাড়ি নয় তো মোটে,
তিন তলা পর্যন্ত ওঠে,
থামগুলো তার এম্‌নি মোটা মোটা।
কিন্তু যদি শুধাও আমায়,
ঐখানেতেই কেন থামায়,
দোষ কি ছিল ষাট-সত্তর তলা—

ইঁট সুরকি জুড়ে জুড়ে'
একেবারে আকাশ ফুঁড়ে
হয় না কেন কেবল গেঁথে চলা—
গাঁথতে গাঁথতে কোথায় শেষে
ছাত কেন না তারায় মেশে—
আমিও তাই ভাবি নিজে নিজে,
কোথাও গিয়ে কেন থামি
যখন শুধাও তখন আমি
জানি নে তো তার উত্তর কী যে।

যখন খুশি ছাতের মাথায়
উঠছি ভারা বেয়ে।
সত্যি কথা বলি, তাতে
মজা খেলার চেয়ে।
সমস্ত দিন ছাতপিটুনি
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নীচে চলছে গাড়িঘোড়া।
বাসনওয়ালা থালা বাজায়,
সুর করে ঐ হাঁক দিয়ে যায়
আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া।

সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে
হো হো করে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।
রোদ্‌দুর যেই আসে প'ড়ে
পুবের মুখে কোথায় ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।
আমি তখন দিনের শেষে
ভারার থেকে নেমে এসে
আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে।
জান তো, মা, আমার পাড়া
যেখানে ওই খুঁটি গাড়া
পুকুর-পাড়ে গাজন-তলার বাঁয়ে।
তোরা যদি শুধাস মোরে
খড়ের চালায় রই কী করে
কোঠা যখন গড়তে পারি নিজে,
আমার ঘর যে কেন তবে
সব চেয়ে না বড়ো হবে—
জানি নে তো তার উত্তর কী যে।

৬ কার্তিক ১৩২৮

ঘুমের তত্ত্ব

জাগার থেকে ঘুমোই, আবার
ঘুমের থেকে জাগি—
অনেক সময় ভাবি মনে,
কেন, কিসের লাগি।
আমাকে, মা, যখন তুমি
ঘুম পাড়িয়ে রাখ
তখন তুমি হারিয়ে গিয়ে
তবু হারাও নাকো।
রাতে সূর্য দিনে তারা
পাই নে হাজার খুঁজি—
তখন তারা ঘুমের সূর্য,
ঘুমের তারা বুঝি?
শীতের দিনে কনকচাঁপা
যায় না দেখা গাছে,
ঘুমের মধ্যে লুকিয়ে থাকে—
নেই তবুও আছে।

রাজকন্যে থাকে আমার
 সিঁড়ির নীচের ঘরে।
দাদা বলে, 'দেখিয়ে দে তো।'
 বিশ্বাস না করে।
কিন্তু, মা, তুই জানিস নে কি
 আমার সে রাজকন্যে
ঘুমের তলায় তলিয়ে থাকে,
 দেখি নে সেইজন্যে।

নেই তবুও আছে এমন
 নেই কি কত জিনিস?
আমি তাদের অনেক জানি,
 তুই কি তাদের চিনিস?
যে দিন তাদের রাত পোয়াবে,
 উঠবে চক্ষু মেলি,
সে দিন তোমার ঘরে হবে
 বিষম ঠেলাঠেলি।
নাপিত ভায়া, শেয়াল ভায়া,
 ব্যাঙ্গমা বেঙ্গমী
ভিড় করে সব আসবে যখন
 কী যে করবে তুমি!

তখন তুমি ঘুমিয়ে পোড়ো,
আমিই জেগে থেকে
নানা রকম খেলায় তাদের
দেব ভুলিয়ে রেখে।
তার পরে যেই জাগবে তুমি
লাগবে তাদের ঘুম—
তখন কোথাও কিচ্ছুই নেই
সমস্ত নিজ্‌ঝুম।

২৭ আশ্বিন ১৩২৮

দুই আমি

বৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে বেড়ায়
উড়ো মেঘের দল হয়ে,
সেই দেখা দেয় আর-এক ধারায়
শ্রাবণ-ধারার জল হয়ে।
আমি ভাবি চুপটি ক'রে
মোর দশা হয় ঐ যদি!
কেই বা জানে আমিই আবার
আর-একজনও হই যদি!
একজনারেই তোমরা চেন,
আর-এক আমি কারোই না।
কেমনতরো ভাবখানা তার
মনে আনতে পারোই না।
হয়তো বা ঐ মেঘের মতোই
নতুন নতুন রূপ ধ'রে
কখন সে যে ডাক দিয়ে যায়,
কখন থাকে চুপ ক'রে?

দুই আমি

কখন বা সে পুবের কোণে
আলো-নদীর বাঁধ বাঁধে,
কখন বা সে আধেক রাতে
চাঁদকে ধরার ফাঁদ ফাঁদে।
শেষে তোমার ঘরের কথা
মনেতে তার যেই আসে,
আমার মতন হয়ে আবার
তোমার কাছে সেই আসে।
আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
দুই রকমের দুই খেলা—
একটা সে ঐ আকাশ-ওড়া,
আর-একটা এই ভুঁই-খেলা।

২৮ আশ্বিন ১৩২৮

মর্তবাসী

কাকা বলেন, সময় হলে
সবাই চ'লে
যায় কোথা সেই স্বর্গপারে।
বল্ তো, কাকী,
সত্যি তা কি
একেবারে ?
তিনি বলেন যাবার আগে
তন্দ্রা লাগে,
ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি—
দ্বারের পাশে
তখন আসে
ঘাটের মাঝি।

বাবা গেছেন এম্‌নি করে
কখন ভোরে,
তখন আমি বিছানাতে।
তেম্‌নি মাখন
গেল কখন
অনেক রাতে।

কিন্তু আমি বলছি তোমায়,
সকল সময়
তোমার কাছেই করব খেলা ;
রইব জোরে
গলা ধ'রে
রাতের বেলা ।
সময় হলে মান্‌ব না তো,
জানব না তো
ঘণ্টা মাঝির বাজল কবে ।
তাই কি রাজা
দেবেন সাজা
আমায় তবে ?

তোমরা বলো স্বর্গ ভালো—
সেথায় আলো
রঙে রঙে আকাশ রাঙায়,
সারা বেলা
ফুলের খেলা
পারুলডাঙায় !
হোক-না ভালো যত ইচ্ছে—
কেড়ে নিচ্ছে
কেই বা তাকে বলো কাকী ?

যেমন আছি
তোমার কাছেই
তেম্‌নি থাকি !

ঐ আমাদের গোলাবাড়ি,
গোরুর গাড়ি
পড়ে আছে চাকা-ভাঙা,
গাবের ডালে
পাতার লালে
আকাশ রাঙা।
সেথা বেড়ায় যক্ষীবুড়ি
গুড়িগুড়ি
আস্‌শেওড়ার ঝোপে-ঝাপে—
ফুলের গাছে
দোয়েল নাচে,
ছায়া কাঁপে।
লুকিয়ে আমি সেথা পলাই,
কানাই বলাই
দু ভাই আসে পাড়ার থেকে।
ভাঙা গাড়ি
দোলাই নাড়ি
ঝেঁকে ঝেঁকে

সন্ধেবেলায় গল্প ব'লে
রাখ কোলে,
মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে বাতি।
চালতা-শাখে
পেঁচা ডাকে,
বাড়ে রাতি।
স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
বলছি কাকী—
দেখব আমায় কে কী করে।
চিরকালই
রইব খালি
তোমার ঘরে।

২৯ আশ্বিন ১৩২৮

বাণীবিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হতিস,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি কথায়
হ'ত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।
মা ব'লে তার সাড়া দেব
কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার
নেচে উঠত তাই।
তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায়
আমার কানে কানে
টল্‌মলিয়ে কী বলত যে
ঝল্‌মলানির গানে।

আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম
আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তারা
নাচন দিত জুড়ি।
উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর
কোথায় থেকে এসে
আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে
কোথায় যেত ভেসে।
সেই হ'ত তোর বাদল-বেলার
রূপকথাটির মতো—
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায়
পেরিয়ে রাজ্য কত।
সেই আমারে ব'লে যেত
কোথায় আলেখ লতা,
সাগর-পারের দৈত্যপুরের
রাজকন্যার কথা।
দেখতে পেতেম দুয়োরানীর
চক্ষু ভরোভরো,
শিউরে উঠে পাতা আমার
কাঁপত থরোথরো।

হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার
হাওয়ার পাছে পাছে
নামত আমার পাতায় পাতায়
টাপুর টুপুর নাচে—
সেই হ'ত তোর কাঁদন-সুরে
রামায়ণের পড়া,
সেই হ'ত তোর গুন্‌গুনিয়ে
শ্রাবণ-দিনের ছড়া।
মা, তুই হতিস নীলবরনী,
আমি সবুজ কাঁচা।
তোর হ'ত, মা, আলোর হাসি—
আমার পাতার নাচা।
তোর হ'ত, মা, উপর থেকে
নয়ন মেলে চাওয়া,
আমার হ'ত আঁকুবাঁকু
হাত তুলে গান গাওয়া।
তোর হ'ত, মা, চিরকালের
তারার মণিমালা,
আমার হ'ত দিনে দিনে
ফুল ফোটাবার পালা।

বৃষ্টি রৌদ্র

ঝুঁটিবাঁধা ডাকাত সেজে
দল বেঁধে মেঘ চলছে যে
আজকে সারা বেলা।
কালো ঝাঁপির মধ্যে ভ'রে
সূর্যকে নেয় চুরি করে—
ভয় দেখাবার খেলা।
বাতাস তাদের ধরতে মিছে
হাঁপিয়ে ছোটে পিছে পিছে,
যায় না তাদের ধরা।
আজ যেন ওই জড়োসড়ো
আকাশ জুড়ে মস্ত বড়ো

মন-কেমন-করা।
বটের ডালে ডানা-ভিজে
কাক বসে ওই ভাবছে কী যে,
চড়ুইগুলো চুপ।
বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে,
শজনেপাতায় ঝ'রে ঝ'রে
জল পড়ে টুপ্ টুপ্।
লেজের মধ্যে মাথা থুয়ে
খাঁদন-কুকুর আছে শুয়ে
কেমন-এক-রকম।
দালানটাতে ঘুরে ঘুরে
পায়রাগুলো কাঁদন-সুরে
ডাকছে বক্‌বকম।
কার্তিকে ঐ ধানের খেতে
ভিজে হাওয়া উঠল মেতে
সবুজ ঢেউয়ের 'পরে।
পরশ লেগে দিশে দিশে
হিহি ক'রে ধানের শিষে
শীতের কাঁপন ধরে।
ঘোষাল-পাড়ার লক্ষ্মী বুড়ি
ছেঁড়া কাঁথায় মুড়িসুড়ি
গেছে পুকুর-পাড়ে,

দেখতে ভালো পায় না চোখে—
বিড়্‌বিড়িয়ে ব'কে ব'কে
　　　　শাক তোলে, ঘাড় নাড়ে।
ঐ ঝমাঝম বৃষ্টি নামে,
মাঠের পারে দূরের গ্রামে
　　　　ঝাপ্‌সা বাঁশের বন।
গোরুটা কার থেকে থেকে
খোঁটায়-বাঁধা উঠছে ডেকে,
　　　　ভিজছে সারা ক্ষণ।
গদাই কুমোর অনেক ভোরে
সাজিয়ে নিয়ে উঁচু ক'রে
　　　　হাঁড়ির উপর হাঁড়ি
চলছে রবিবারের হাটে—
গামছা মাথায়, জলের ছাটে
　　　　হাঁকিয়ে গোরুর গাড়ি।
বন্ধ আমার রইল খেলা,
ছুটির দিনে সারা বেলা
　　　　কাটবে কেমন করে ?
মনে হচ্ছে এমনিতরো
ঝরবে বৃষ্টি ঝরোঝরো
　　　　দিন রাত্তির ধ'রে।

এমন সময় পুবের কোণে
কখন যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে যায় মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
হঠাৎ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে।
ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে,
লাগায় ঝিলিমিলি—
বাঁশ-বাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুল গাছের পাতায় পাতায়
হাসায় খিলিখিলি।
হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে
বাদল-বেলার কথা।
হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
বেড়ার ঝুমকোলতা।

উপর নীচে আকাশ ভ'রে
এমন বদল কেমন ক'রে
হয় সে কথাই ভাবি।
উলট-পালট খেলাটি এই,
সাজের তো তার সীমানা নেই—
কার কাছে তার চাবি ?
এমন যে ঘোর মন খারাপি
বুকের মধ্যে ছিল চাপি
সমস্তখন আজি—
হঠাৎ দেখি সবই মিছে,
নাই কিছু তার আগে পিছে—
এ যেন কার বাজি !

—

'শিশু ভোলানাথ' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা 'মৌচাক' 'সন্দেশ' 'প্রবাসী' 'বঙ্গবাণী' 'রংমশাল' 'শ্রেয়সী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সময়হারা' কবিতাটি ১৩৩০ বৈশাখের 'সন্দেশ' পত্রিকা হইতে বর্তমান সংস্করণে নূতন সংকলিত হইল।

'শিশু ভোলানাথ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'যাত্রী'র 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশে লিখিয়াছেন—

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক মোটরে নিমন্ত্রণসভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে খবর দিলেন যে, আজকাল পদ্য আকারে যে-সব রচনা করছি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করছে না। যারা পছন্দ করছে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধি-স্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়ের কথা— সেই আত্মীয়েরা কবি; আর, যে-সব পদ্য-রচনা লোকে পছন্দ করে না তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন আমার গানগুলো আর আমার 'শিশু ভোলানাথ' -নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি বললেন, আমার বন্ধুরাও আশঙ্কা করছেন আমার কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।

কালের ধর্মই এই। মর্ত্যলোকে বসন্ত-ঋতু চিরকাল থাকে না। মানুষের ক্ষমতার ক্ষয় আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময় তারই হিসাবটা স্মরণ করা ভালো। রাত্রিশেষে দীপের আলো নেববার সময় যখন সে তার শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দাবিতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবিটাই যার বেহিসাবি, দাবি অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভুল থাকবেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ ফস্ করে মারা গেল বলে চিকিৎসা-শাস্ত্রটাকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা বাক্যব্যয়। অতএব, কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়ছে আমার আয়ু ততই কমে যাচ্ছে, তা হলে

তাকে আমি নিন্দুক বলি নে, বড়ো জোর এই বলি যে, লোকটা বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, এই বিধিলিপি নিয়ে, যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, কবি হোক, অকবি হোক, কারও সঙ্গে তকরার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক আর না হোক। এমন-কি, সেই অবসরে 'শিশু ভোলানাথ'এর জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তা হলেও মনটা খুশি থাকে।···

···ওই 'শিশু ভোলানাথ'এর কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম। সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিতান্ত নিজের গরজে।

পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম, জমিয়ে তোলবার মতো এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর-কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জায়গায় এই-সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে, সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে— পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে-যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ; সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়; সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে;

এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এসব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্‌গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাস-রুদ্ধ-প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।

৭ অক্টোবর ১৯২৪

—

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

মূল্য ১'০০ টাকা